সপ্তম অধ্যায়

চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়

অসীম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি নিছকই একটি বড় সংখ্যা নয়। প্রকাণ্ডরকম ও অকল্পনীয়ভাবে বড় কিছুর চেয়ে বৈশিষ্ট্যগতভাবে অসীম একেবারেই আলাদা। ধরুন, মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে প্রসারিত হচ্ছে।, যার নেই কোনো শেষ। চিরকাল টিকে থাকার অর্থ হবে এর আয়ু হবে অসীম। এমন ক্ষেত্রে যে-কোনো ভৌত প্রক্রিয়া(physical process) কোনো না কোনো সময় ঘটবেই। চাই তা যতই ধীরগতির কিংবা অসম্ভাব্য হোক না কেন। যেমনিভাবে একটি বানর অনন্তকাল ধরে এলোপাথাড়ি কিবোর্ড চাপতে থাকলে একসময় না একসময় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বইগুলো লেখা হয়ে যাবেই।

মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গমনের ঘটনা থেকে ভাল একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। এটা নিয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে কথা বলেছি। শুধু প্রকাণ্ড বড় কোনো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি ক্ষয় থেকে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে তরঙ্গ নির্গত হয় প্রায় এক মিলিওয়াট। পৃথিবীর গতির ওপর এর প্রভাব ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র (infinitesimal)। কিন্তু এতটুকু শক্তির ক্ষয়ও ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন১ বছর ধরে চলতে থাকলে একসময় পৃথিবী সর্পিল পথ বেয়ে সূর্যে গিয়ে ধাক্কা খাবে। হ্যাঁ, তার আগেই সূর্য পৃথিবীকে গিলে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু কথা হলো, যে সময়কালটা মানুষের সময়ের হিসেবে খুব নগণ্য কিন্তু অল্প অল্প করে হলেও অবিরত থাকে, সেটাই একসময় প্রকট হয়ে উঠে ভৌত ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ (physical system) ঠিক করে দিতে পারে।

এখন থেকে অনেক অনেক সময় পরের মহাবিশ্বের অবস্থার কথা একটু চিন্তা করি। ধরুন, আজ থেকে এক হাজার কোটি কোটি কোটি (মানে ১ পর ২৪টি শূন্য) বছর পরের কথাই ধরুন না। সব নক্ষত্র জ্বালানি ফুরিয়ে আলোহীন হয়ে গেছে। মহাবিশ্বটা এখন অন্ধকার। কিন্তু ফাঁকা নয়। বিশাল শূন্যতার এখানে-সেখানে রয়েছে ঘুরন্ত কৃষ্ণগহ্বররা। রয়েছে দলছুট নিউট্রন নক্ষত্র। আর রয়েছে কালো বামন (black dwarf)। ও, আছে কিছু গ্রহের অবশেষও। এই সময় এই বস্তুগুলো একে ওপর থেকে থাকবে অনেক অনেক দূরে। মহাবিশ্ব ততদিনে প্রসারিত হয়ে এর বর্তমান আকারের ১০ হাজার ট্রিলিয়ন গুণ হয়েছে।

মহাকর্ষ বল খেলবে এক অদ্ভুত খেলা। প্রসারমান মহাবিশ্ব চাইবে সবগুলো বস্তুকে একে ওপর থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু বস্তুদের পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। চাইবে আরও কাছে আসতে। এর ফলে কিছু কিছু বস্তু মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধই থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ছায়াপথপুঞ্জ ও বহু বছরের কাঠামো বিকৃতির পরেও যে ছায়াপথরা টিকে থাকবে। তবে এরাও এদের আশেপাশের বস্তুগুলো থেকে দূরে সরে যাবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ হার কত দ্রুত কমবে তার ওপর নির্ভর করবে কাছে টানা ও দূরে সরানোর এই যুদ্ধের ফল। মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব যত কম হবে, উপরোক্ত বস্তুগুলো তত সহজে আশেপাশের বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ঘুরতে থাকবে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে।

মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ সিস্টেমের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ ধীরে হলেও তার তীব্র আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মহাকর্ষ তরঙ্গের নির্গমন দুর্বল হলেও ঘাতকের মতো ক্রমশ সিস্টেমের শক্তি শেষ করে দেয়। যার ফল একটি ধীর ও সর্পিল পথের মৃত্যু। এভাবে ধীরে ধীরে এক মৃত তারা অন্য মৃত তারা বা কৃষ্ণগহবরের দিকে অগ্রসর হবে। এক সময় গিলে খাবে একে ওপরকে। সূর্যের কক্ষপথ ধ্বংস করতে মহাকর্ষ তরঙ্গের সময় লাগবে এক হাজার কোটি কোটি কোটি বছর। সূর্য তত দিনে হবে একটি কালো বামন নক্ষত্র। দেখতে অঙ্গারের মতো। ধীরে ধীরে যেতে থাকবে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে। যেখানে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণগহবর হা করে আছে তাকে গিলে খাবার জন্যে।

এটা নিশ্চিত করে বলার কোনো সুযোগ নেই যে সূর্যের মৃত্যু এভাবেই হবে। সর্পিল পথে এগিয়ে যাবার সময় অন্য নক্ষত্রের সাথেও এর দেখা হবে। অনেক সময় এটি চলে আসবে কোনো বাইনারি সিস্টেমের কাছে। যেখানে দুটো তারকা মহাকর্ষীয় বন্ধনে ঘুরপাক খাচ্ছে। এরপর ঘটে এক মজার ঘটনা। যার নাম মহাকর্ষীয় নিক্ষেপণ (gravitational slingshot)। দুটো বস্তুর একে ওপরের চারপাশের ঘূর্ণন এর সরলতার জন্য বিখ্যাত। এই বিষয়টিই কেপলার ও নিউটনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। যে ব্যস্ততা থেকেই জন্ম আধুনিক বিজ্ঞানের। তাঁরা এক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন সূর্য ও পৃথিবী বস্তু দুটি নিয়ে। একটি আদর্শ পরিবেশের কথা চিন্তা করলে ও মহাকর্ষীয় বিকিরণের কথা বাদ দিলে গ্রহটির এই গতি নিয়মিত ও পর্যাবৃত্ত। মানে নির্দিষ্ট সময় পরপর গতি একই রকম হয়। আপনি যত সময়ই অপেক্ষা করুন না কেন, গ্রহ একইভাবে কক্ষপথে চলতে থাকে। তবে তৃতীয় একটি বস্তু যুক্ত হলেই অবস্থা আমূল পাল্টে যায়। সেটা এক নক্ষত্র ও দুই কিংবা তিন নক্ষত্র যাই হোক। গতি এখন আর সরল ও পর্যাবৃত্ত হবে না। তিন বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ সবসময় জটিল উপায়ে পাল্টে যেতে থাকবে। এর ফলে এই ব্যবস্থার (system) উপাদান বস্তুগুলোর মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে না। এমনকি তারা একই রকম বস্তু হলেও না। চলতে থাকে বরং এক জটিল নৃত্য। যেখানে একটু বস্তু ও সাথে অন্য একটু বস্তুই শক্তির প্রধান অংশ দখল করে। দীর্ঘ সময়ের কথা চিন্তা করলে ঐ ব্যবস্থার আচরণ অনিবার্যভাবে দৈব (random)। সত্যি বলতে, মহাকর্ষীয় গতিবিদ্যার তিন বস্তুর সমস্যা (three-body problem) বিশৃঙ্খল (chaotic) ব্যবস্থারও একটি ভাল উদাহরণ। এমনও হতে পারে যে দুটি বস্তু মিলে উপস্থিত শক্তির এতটাই নিয়ে ফেলে যে তৃতীয় বস্তুটা ব্যবস্থা থেকেই ছিটকে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো। এ কারণেই এ প্রক্রিয়াকে বলে মহাকর্ষীয় নিক্ষেপণ।

নিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নক্ষত্রস্তবক থেকে ছিটকে যেতে পারে নক্ষত্র। এমনকি ছায়াপথ থেকেও ছিটকে যেতে পারে। দূর ভবিষ্যতে মৃত নক্ষত্র, গ্রহ ও কৃষ্ণগহ্বরদের বড় অংশ এভাবে আন্তঃছায়াপথীয় স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। হয়ত এ ঘটনার মাধ্যমে সাক্ষাৎ হবে অন্য কোনো ভাঙনরত ছায়াপথের সাথে। অথবা এটি চিরকাল বিশাল প্রসারণশীল শূন্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। তবে এই প্রক্রিয়া ঘটবে খুব ধীরে। এটা ঘটতে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের এক শ কোটি গুণ সময় লাগবে। অবশিষ্ট বস্তুগুলো ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করবে। মিলিত হয়ে গড়ে তুলবে বিশাল বপুর (gigantic) কৃষ্ণগহ্বর।

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিদদের কাছে খুব ভাল প্রমাণ আছে যে বর্তমানেই কিছু কিছু ছায়াপথের কেন্দ্রে বিশাল বিশাল কৃষ্ণগহ্বর আছে।এর ঘূর্ননশীল গ্যাস গিলে খাচ্ছে। বিনিময়ে বিমুক্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। সময় এলে এমন টালমাটাল ঘটনার শিকার হবে সব ছায়াপথ। এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না কৃষ্ণগহ্বরের পার্শ্ববর্তী সব বস্তু হয় দূরে ছিটকে যাবে নয়ত কৃষ্ণগহ্বরের পেতে চলে যাবে। ছিটকে যাওয়া বস্তু আবার ফিরে আসতেও পারে। আবার ক্রমশ হালকা হয়ে আসা আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের সাথেও মিশে যেতে পারে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা কৃষ্ণগহ্বরটি এবার মোটামুটি নিথর হয়ে থাকবে। শুধু থেকে থেকে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন নিউট্রন নক্ষত্র কিংবা কৃষ্ণগহ্বর এসে মিশে যাবে এর সাথে। তবে কৃষ্ণগহ্বরের জীবন এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং আবিষ্কার করলেন কৃষ্ণগহ্বর ঠিক কৃষ্ণ নয়। তারা বরং একটি দুর্বল তাপের আভা বিকিরণ করে।

এই হকিং বিকিরণ ঠিকভাবে বুঝতে হলে লাগবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তত্ত্বটা সহজ নয়। মহাবিশ্বের স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার সময় আমি এর কথা আলোচনা করেছি। হয়ত মনে আছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান বক্তব্য হলো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। নীতিটি বলছে, কোয়ান্টাম কণাদের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের সুসংজ্ঞায়িত মান থাকে না। যেমন ধরুন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফোটন বা ইলেকট্রন কণার শক্তির পরিমাণের নির্দিষ্ট কোনো মান থাকা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে, একটি অতিপারমাণবিক কণা শক্তি 'ধার' করতে পারে। শর্ত হলো খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই শক্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়েই বলেছি, শক্তির এই ধার করা থেকে কিছু আগ্রহোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হলো আপাত দৃষ্টিতে শূন্য স্থানে স্বল্পায়ু বা ভার্চুয়াল কণার উপস্থিতি। এটা থেকে পাওয়া যায় এক অদ্ভুত ধারণা। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম। এটা এমন এক ভ্যাকুয়াম ('ফাঁকা স্থান’), যেটি ফাঁকা থাকার বদলে অস্থির ভার্চুয়াল কণার উপস্থিতিতে মুখর থাকে। এই কার্যক্রম সাধারণত চোখে পড়ে না। তবে এর ভৌত প্রভাব কিন্তু আছে। এমন একটি ফলাফল পাওয়া যায় ভ্যাকুয়ামের এই কার্যক্রম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হলে।

ভার্চুয়াল কণাদের একটি চরম পরিবেশ পাওয়া যায় কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের কাছে। আগেই বলেছি, ধার করা শক্তির সাহায্যে ভার্চুয়াল কণারা অল্প সময়ের জন্য অস্তিত্বমান থাকে। একটু পরেই শক্তিটুকু দিয়ে দিতে হয়। কণাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কোনো কারণে ভার্চুয়াল কণারা বাইরের কোনো উৎস থেকে শক্তির বড় কোনো সরবরাহ পেলে তাদের ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়ে গেল। অতএব, ঋণ পরিশোধের জন্যে এবার আর তাদেরকে বিলীন হয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। এবার এরা কম-বেশি স্থায়ী অস্তিত্ব পাবে।

হকিংয়ের মতে এমন ঋণসাহায্যের ঘটনাই ঘটে ব্ল্যাক হোলের কাছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেওয়া দাতা হলো ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। কাজটি ঘটে এভাবে: সাধারণত ভার্চুয়াল কণারা তৈরি হয় জোড়ায় জোড়ায়। আর গতি থাকে বিপরীত থাকে। ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে এমন এক জোড়া নতুন কণার কথা চিন্তা করুন। ধরুন, কণাদের গতি এমন যে একটি কণা ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে চলে গেল। যাওয়ার সময় এটি ব্ল্যাক হোলের তীব্র মহাকর্ষ থেকে প্রচুর শক্তি লাভ করবে। হকিং দেখলেন, এই শক্তিটুকু দিয়ে পুরো ঋণটাই শোধ করে ফেলা যায়। এর মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলের ভেতরের ও বাইরের দুটি কণাই বাস্তব কণায় পরিণত হয়। দিগন্তের বাইরের বিচ্ছিন্ন কণাটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হতে পারে, এটিও ব্ল্যাক হোলের দিকে চলে আসবে। আবার উচ্চ বেগে ব্ল্যাক হোল থেকে উল্টো দিকেও যেতে পারে। পালিয়ে যেতে পারে ব্ল্যাক হোলের ত্রিসীমানা থেকে। অতএব হকিং বলছেন, ব্ল্যাক হোল থেকে দূরের দিকে এমন ঝাঁক কণা অবিরাম পালাতে থাকবে। এ ঘটনারই নাম হকিং বিকিরণ।

আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলের জন্যেই হকিং বিকিরণ সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। একটি ভার্চুয়াল ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করুন। সাধারণ অবস্থায় এটি ঋণ পরিশোধ করার আগে সর্বোচ্চ ১০-১১ সেন্টিমিটার পথ যেতে পারে। তার মানে শুধু এর চেয়ে ছোট মাত্রার (প্রায় পরমাণুর কেন্দ্রের সমান) ব্ল্যাক হোলই শুধু সত্যিকার অর্থে ইলেকট্রনের ফোয়ারা তৈরি করতে পারবে। ব্ল্যাক হোল এর চেয়ে বড় হলে বেশিরভাগ ভার্চুয়াল ইলেকট্রনই ঋণ পরিশোধের আগে ঘটনা দিগন্ত থেকে বের হতে পারবে না।

একটি ভার্চুয়াল কণা কতটা পথ যাবে সেটা নির্ভর করে সেটি কত সময় বাঁচবে তার ওপর। এটা আবার নির্ভর করে ধারকৃত শক্তির পরিমাণের ওপর। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে। ঋণ যত বেশি হবে, কণার আয়ু হবে তত কম। শক্তি ধার করার বড় একটি অংশ হলো কণার নিশ্চল ভরশক্তি। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ অন্তত ইলেকট্রনের নিশ্চিল ভরের সমান হতে হবে। প্রোটন বা এমন আরও বেশি নিশ্চল ভরের কণার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ হবে আরও বড়। তাই মেয়াদকালও হবে কম। তার মানে অতিক্রান্তও পথও হবে অল্প। তাহলে ভাবুন হকিং বিকিরণের মাধ্যমে প্রোটন তৈরি করতে হলে কেমন পরিবেশ লাগবে। লাগবে এমন এক ব্ল্যাক হোল, যা পরমাণুর কেন্দ্রের মাত্রার চেয়েও ছোট। অন্য দিকে নিউট্রিনো বা এমন আরও কম নিশ্চল ভরের কণা তৈরি হবে এমন ব্ল্যাক হোলে যার মাত্রা পরমাণুর কেন্দ্রের মাত্রার চেয়ে বড়। ফোটনের নিশ্চল ভর শূন্য। এটা যে-কোনো আকারের ব্ল্যাক হোলই তৈরি করতে পারবে। এমনকি মাত্র এক সৌর ভরের ব্ল্যাক হোলও হকিং প্রবাহের মাধ্যমে ফোটন, এমনকি সম্ভবত নিউট্রিনোও নির্গত করবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রবাহের তীব্রতা হবে খুব দুর্বল।

এখানে 'দুর্বল' কথাটায় এতটুকুও অত্যুক্তি নেই। হকিং দেখলেন, ব্ল্যাক হোল দিয়ে সৃষ্ট শক্তির বর্ণালি একটি উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের মতোই। অতএব, হকিং প্রভাবের তীব্রতা পরিমাপ করার একটি উপায় হলো তাপমাত্রা। পরমাণুর কেন্দ্রের আকারের (ব্যাস ১০\_১৩ সেন্টিমিটার) একটি ব্ল্যাক হোলের তাপমাত্রা অনেক অনেক বেশি। প্রায় এক হাজার ডিগ্রি। অন্য দিকে সৌর ভরের একটি ব্ল্যাক হোলের ব্যাস মাত্র এক কিলোমিটার। আর তাপমাত্রা পরম শূন্য২ তাপমাত্রার ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম। হকিং বিকিরণের মাধ্যমে পুরো বস্তুটি এক ওয়াটের এক হাজার কোটি-কোটি-কোটি ভাগেরও কম পরিমাণ বিকিরণ উদ্গীরণ করবে।

হকিং প্রভাবের অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এর একটি হলো ব্ল্যাক হোলের ভর যত কম কম হয়, বিকিরণের তাপমাত্রা হয় তত বেশি। তার মানে ছোট ব্ল্যাক হোলরা বেশি উত্তপ্ত হয়। বিকিরণের মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলের শক্তি কমতে থাকে। ফলে কমে ভরও। আর এটি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ফলে এটি আরও উত্তপ্ত হয়। ফলে বিকিরণ হয় আরও বেশি। তার মানে ছোট হয় আরও দ্রুত গতিতে। স্বভাবগতভাবেই প্রক্রিয়াটি অস্থিতিশীল কিন্তু শক্তিশালী। ব্ল্যাক হোল ক্রমশই আগের চেয়ে দ্রুত শক্তি নির্গত করতে থাকে ও আকারে ছোট হতে থাকে।

হকিং প্রভাব বলছে, বিকিরণ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সব ব্ল্যাক হোল নিঃশেষ হয়ে যাবে। শেষের মুহূর্তগুলো হবে দেখার মতো। মনে হবে যেন এক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। তীব্র তাপ শক্তির এক স্বল্পস্থায়ী ঝলক। তারপর? তারপর আর কিছুই না। তত্ত্ব অন্তত সে কথাই বলছে। তবে কিছু কিছু পদার্থবিদ ব্ল্যাক হোলকে মেনে নিতে পারছেন না। কেন একটি জড় পদার্থ গুটিয়ে গিয়ে ব্ল্যাক হোল হবে? তাও আবার পরে ত=শুধু তাপ বিকিরণ রেখে নিজে মিলিয়ে যাবে শূন্যে!

তাদের উদ্বেগের কারণ হলো, দুটি একদম আলাদা বস্তু অবিকল একই রকম তাপ বিকিরণের জন্ম দিতে পারে। ফলে মূল ব্ল্যাক হোলের আগের কোনো তথ্য সংরক্ষিত থাকছে না। এমন উধাও হওয়ার । প্রক্রিয়া সব ধরনের সংরক্ষণশীলতা নীতির বিপক্ষে। তবে বিকল্প একটি ব্যাখ্যাও আছে। হয়ত উধাও হওয়ার আগে ব্ল্যাক হোল একটি সূক্ষ্ম ধ্বংসাবশেষ রেখে যায়। যাতে কোনোভাবে বিপুল পরিমাণ তথ্য রক্ষিত থাকে। সে যাই হোক, ব্ল্যাক হোলের ভরের বিশাল একটি অংশ তাপ ও আলো আকারে বিকিরিত হয়ে যাচ্ছেই।

হকিং প্রক্রিয়া অভাবনীয়ভাবে ধীরে কাজ করে। এক সৌর ভরের একটি ব্ল্যাক হোলই নিঃশেষ হতে ১০৬৬ বছর সময় নেবে। অন্য দিকে একটি সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাক হোলের সময় লাগবে ১০৯৩ বছর। তাও আবার প্রক্রিয়াটি শুরুই হবে না যতক্ষণ না মহাবিশ্বের পটভূমি তাপমাত্রা সেই ব্ল্যাক হোলের তাপমাত্রার নীচে না নামে। অন্যথায় আশেপাশের অঞ্চল থেকে ব্ল্যাক হোলের দিকে প্রবাহিত তাপের তীব্রতা ব্ল্যাক হোল থেকে হকিং প্রভাবের মাধ্যমে নির্গত তাপের চেয়ে বেশি হবে। বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের বর্তমান তাপমাত্রা পরম শূন্যের তিন ডিগ্রি ওপরে। সৌর ভরের ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে তাপ বিকিরণের নিঃসরণ ও আগমনের ভারসাম্য (সমান-সমান) হওয়ার তাপমাত্রা কমে আসতে সময় লাগবে ১০২২ বছর। হকিং বিকিরণ এমন কিছু নয় যা কিছুক্ষণ বসেই দেখে ফেলতে পারব।

তবে চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়। তাই চিরকাল অপেক্ষা করতে পারলে সম্ভবত সব ব্ল্যাক হোল, এমনকি অতিভারীদেরকেও উধাও হতে দেখা যাবে। চিরন্তন মহাজাগতিক অমানিশার আলোর ক্ষণস্থায়ী ঝলক দেখিয়ে ব্ল্যাক হোল তার মৃত্যু-বেদনার প্রকাশ করবে। কোটি কোটি সূর্যের সমান তেজস্বী বস্তুটার বিদায় ঘণ্টা বাজল আজ।

বাকি থাকল তাহলে কী?

সব পদার্থ ব্ল্যাক হোলে পতিত হয় না। নিউট্রন নক্ষত্র ও কৃষ্ণবামন নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে। এছাড়াও আছে নিঃসঙ্গ গ্রহ, যারা একাকী আন্তঃছায়াপথীয় স্থানে ঘুরে বেড়ায়। শুধু কি তাই? আরও আছে গ্যাস ও ধূলিকণার হালকা আবরণ। যেগুলো কখনোও সমবেত হয়ে নক্ষত্রে পরিণত হতে পারেনি। আরও আছে গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ও ও বিভিন্ন সৌরব্যবস্থার পুরনো পাথরখণ্ড। এসব বস্তুরা কি চিরকাল টিকে থাকবে?

এখানে এসে আমরা তাত্ত্বিক সমস্যায় পড়ে যাই। আমাদেরকে জানতে হবে সাধারণ পদার্থ, মানে আমরা মানুষরা এবং পৃথিবী যেসব বস্তু দিয়ে গড়া তা কি একেবারে স্থিতিশীল? ভবিষ্যতে কী ঘটবে তার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওপর। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া সাধারণত পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তবে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নীতি সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবার কথা। প্রযোজ্য হবার কথা আণুবীক্ষণিক বস্তুর ক্ষেত্রেও। বড় বস্তুদের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ফলাফল অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র। তবে দীর্ঘ সময়ে সেটাও বড় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনিশ্চয়তা ও সম্ভবনা। কোয়ান্টাম জগতে কিছুই নিশ্চিত নয়। আছে শুধু সম্ভাবনা। তার মানে কোনো একটি ঘটনা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ সময় পেলে এটি ঘটবেই। তার সম্ভাবনা যতই কম হোক। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটির প্রতিফলন দেখি। ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর নিউক্লিয়াস প্রায় সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। তবে এটি থেকেও একটি আলফা কণা নিক্ষিপ্ত হয়ে থোরিয়াম তৈরি হয়ে যাবার ছোট একটি সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। আরও সঠিক করে বললে, প্রতি একক সময়ে একটি নির্দিষ্ট ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভেঙে যাবার একটি খুব ছোট সম্ভাবনা আছে। এটা ঘটতে গড়ে সাড়ে চারশো কোটি বছর সময় লাগে। তবে পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রতি একক সময়েই একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা চায়। ফলে যে-কোনো ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রই একসময় না একসময় ভাঙবেই।

ভাবুন, আলফা কণার তেজস্ক্রিয় ক্ষয় কেন ঘটে? কারণ ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থানে একটুখানি অনিশ্চয়তা আছে। ফলে সবসময় ক্ষুদ্র হলেও এক গুচ্ছ কণা অল্প সময়ের জন্য নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করার একটি সম্ভাবনা আছে। ফলে নিউক্লিয়াস থেকে তারা দ্রুত দূরে ধাবিত হয়। একইভাবে কঠিন পদার্থের পরমাণুর অবস্থানের ব্যাপারেও একটি আরও ছোট কিন্তু অশূন্য অনিশ্চয়তা আছে। যেমন হীরার মধ্যে একটি কার্বন পরমাণুর কথা ভাবুন। এটি স্ফটিকের ল্যাটিসের মধ্যে খুবই সুসংজ্ঞায়িত জায়গায় অবস্থান করে। দূর ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের প্রত্যাশিত তাপমাত্রা শূন্যের কাছে পৌঁছলেই এই অবস্থান অস্থিতিশীল হওয়ার কথা। কিন্তু পুরোপুরি নয়। পরমাণুটির অবস্থানে সবসময়ই একটি ক্ষুদ্র অনিশ্চয়তা আছে। এর মানে হলো, ল্যাটিস থেকে পরমাণুটি বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। এমন প্রস্থান প্রক্রিয়ার কারণে কোনও পদার্থ, এমনকি হীরার মতো কঠিন পদার্থও সত্যিকার অর্থে কঠিন নয়। বরং, যাকে দেখতে কঠিন মনে হয় সেটি আসলে অনেক বেশি আঠালো একটি তরল পদার্থ। এবং অনেক বেশি সময় পেলে এটিও তরলের মতো প্রবাহিত হতে পারবে। কারণ হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রভাব। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন হিসেব করে দেখেছেন, প্রায় ১০৬৫ বছর পরে যত্নের সাথে কাটা প্রতিটি হীরকখণ্ড গোলাকার গুটিতে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, প্রতি টুকরো পাথরও পরিণত হবে মসৃণ গোলকে।

অবস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে নিউক্লীয় রূপান্তরও ঘটে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে হীরার স্ফটিকের দুটো প্রতিবেশী পরমাণুর কথা ভাবুন। খুব কম ঘটলেও অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস স্বতস্ফূর্তভাবেই সামান্য সময়ের জন্য এর প্রতিবেশী পরমাণুর পাশে আবির্ভূত হয়। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণী বল হয়ত তখন দুটো নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে ম্যাগনেসিয়ামের একটি নিউক্লিয়াস বানিয়ে দেবে। তার মানে নিউক্লীয় ফিউশন (সংযোজন) ঘটার জন্যে খুব উচ্চ তাপমাত্রা না হলেও চলে। শীতল সংযোজনও সম্ভব। তবে এর জন্যে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সময়। ডাইসন হিসেব করে দেখেছেন, ১০১৫০০ বছর (তার মানে ১ এর পরে ১৫০০টি শূন্য) পরে সব পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে সবচেয়ে স্থিতিশীল নিউক্লিয় আকৃতি লাভ করবে। এটা হলো লৌহ।

তবে হতেই পারে যে নিউক্লিয় বস্তুটি এতটা সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে না। এর কারণ হলো খুব ধীরগতির হলেও আরও দ্রুতগতির নিউক্লিয় রূপান্তর প্রক্রিয়া। ডাইসনের পরিমাপে প্রোটনকে (ও নিউক্লিয়াসে থাকা নিউট্রনকে) পুরোপুরি স্থিতিশীল ধরে নেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, একটি প্রোটন ব্ল্যাক হোলে পতিত না হলে বা অন্য কোনোভাবে উত্তেজিত না হলে এটি চিরকাল টিকে থাকবে। কিন্তু বিষয়টা কি আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি? আমার ছাত্রজীবনে এটা নিয়ে কারোই সন্দেহ ছিল না। প্রোটনরা ছিল অবিনশ্বর। তারা ছিল পুরোপুরি স্থিতিশীল। তবে একটুখানি অস্বস্তিকর সন্দেহ সবসময়ই ছিল। সমস্যাটির সাথে জড়িয়ে আছে পজিট্রন নামে একটি কণা। এটি ইলেকট্রনের মতোই। পার্থক্য একটি জায়গায়। প্রোটনের মতোই এর চার্জ ধনাত্মক। প্রোটনের চেয়ে এরা অনেক হালকা। ফলে, অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে প্রোটনরা পজিট্রন হয়ে যেতে চাইবে। পদার্থবিদ্যায় ভৌত ব্যবস্থাগুলো

physical system) একটি গূঢ় নীতি মেনে চলে। এই ব্যবস্থাগুলো সবসময় ন্যূনতম শক্তির অবস্থায় যেতে চায়। আর অল্প ভর মানে অল্প শক্তি। এখন, কেউই বলতে পারবেন না, কেন প্রোটনরা এই কাজটি করে না। তাই পদার্থবিদরা অনুমান করে নিলেন, প্রকৃতির কোনো সূত্র হয়ত একে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিছুদিন আগেও বিষয়টি একমদ দূর্বোধ্য ছিল। তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র অনুসারে নিউক্লিয় বলগুলো কীভাবে এক কণাকে অন্য কণায় রূপান্তরিত করে সে সম্পর্কে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হয় ১৯৭০ এর দশকে। সর্বশেষ তত্ত্বগুলো অনুসারে প্রোটনের ক্ষয়ের বিপরীতে কাজ করা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবে এমন বেশিরভাগ তত্ত্বই বলছে, সূত্রটি %১০০ ফলপ্রসূ নয়। একটি প্রোটন পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যাবার একটি ছোটখাট সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বাকি ভরটুকুর কিছু অংশ বৈদ্যুতিকভাবে আধান নিরপেক্ষ কোনো কণায় পরিণত হতে পারে। যেমন তথাকথিত পাইওন। কিছু অংশ আবার গতি শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে (ক্ষয়ের ফেল সৃষ্ট বস্তুগুলো উচ্চ বেগে চলাচল করবে)।

সবচেয়ে সরল একটি তাত্ত্বিক নমুনা অনুসারে প্রোটন ক্ষয়ের জন্য গড় সময়ের প্রয়োজন ১০২৮ বছর। এটা মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের দশ হাজার-কোটি-কোটি গুণ। এ কারণে আপনার কাছে হয়ত মনে হবে প্রোটন ক্ষয়ের বিষয়টি শুধুমাত্র কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিষয়টির সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্স জড়িয়ে আছে। ফলে সহজাতভাবেই এটি সম্ভাবনা নির্ভর। ১০২৮ বছর হলো পূর্বাভাসকৃত গড় আয়ু। সব প্রোটনের পকৃত আয়ু নয়। অনেক বেশি প্রোটনের কথা বিবেচনা করলে আমাদের চোখের সামনেই একটি প্রোটনের ক্ষয় দেখার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। সত্যি বলতে, ১০২৮ টি প্রোটনের কথা বিবেচনা করলে প্রায় প্রতি বছর একটি করে প্রোটন ক্ষয় হওয়ার কথা। আর মাত্র ১০ কেজি পদার্থেই আছে ১০২৮টি প্রোটন।

তবে আসলে যেটা ঘটল, তত্ত্বটা জনপ্রিয় হবার আগেই প্রোটনের এই রকম আয়ু থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষামূলকভাব এবাতিল হয়ে যায়। তবে তত্ত্বটির বিভিন্ন রূপভেদে আরও বেশি আয়ুর কথা বলা হয়েছে। ১০৩০ বা ১০৩২ বছর। বা আরও বেশি। কিছু কিছু তত্ত্ব তো ১০৮০ বছর পর্যন্ত অনুমান করে। অল্প মানগুলো পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইযোগ্য। যেমন ১০৩২ বছর ক্ষয়কালের অর্থ হবে আপনার পুরো আয়ুষ্কালে আপনি শরীর থেকে একটি বা দুটি প্রোটন হারাতে পারেন। কিন্তু এমন দুর্লভ ঘটনা কীভাবে শনাক্ত করা সম্ভব?

এর জন্য একটি কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। হাজার হাজার টন পদার্থ জড় করা হয়। এর পর খুব সংবেদনশীল ডিটেক্টর দিয়ে বহু মাস যাবত এগুলোর ওপর নজর রাখা হয়। ডিটেক্টরকে এমনভাবে রাখা ছিল যাতে একটি প্রোটন ক্ষয়ের উৎপাদকও সঙ্কেত দেবে। তবে দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো প্রোটন ক্ষয় খোঁজা খরের গাদায় সুঁই খোঁজার মতোই। কারণ, এমন ক্ষয় মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাবে ঘটা আরও এমন বহু বেশিসংখ্যক ঘটনার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে মহাকাশ থেকে আসা উচ্চশক্তির কণার আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। এর ফলে অতিপারমাণবিক কণিকার একটি সর্বদা-উপস্থিত পটভূমি তৈরি হচ্ছে। এই ব্যতিচার কমানোর জন্য পরীক্ষা চালাতে হয় মাটির নীচে।

মাটির আধমাইলের বেশি নীচে এ ধরনের একটি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। জায়গাটা ওহাইয়োর ক্লিভল্যান্ডের একটি লবণের খনিতে অবস্থিত। ১০ হাজার টন অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ পানিকে ঘনাকার ট্যাংকে রেখে ডিটেক্টর দিয়ে ঘেরাও করে যন্ত্র নির্মাণ করা হয়। পানি ব্যবহারের কারণ এর স্বচ্ছতা। ফলে ডিটেক্টর একবারে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রোটন দেখতে পাবে। বুদ্ধিটা ছিল এমন: যদি ভাল কোনো তত্ত্বের কথা অনুসারে প্রত্যাশিত উপায়ে কোনো প্রোটনের ক্ষয় ঘটে তাহলে এটি একটি পজিট্রনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ পাইওন তৈরি করবে। এটা আমরাও আগেও ব্যাখ্যা করেছি। এই পাইওনও আবার দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাবে। সাধারণত এ ক্ষয় থেকে দুটি খুব তেজস্বী ফোটন বা গামা রশ্মি তৈরি হবে। শেষে এই গামা রশ্মি পানির নিউক্লিয়াসের দেখা পায়। প্রতিটি থেকে তৈরি হয় একটি ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়। এরাও হয় খুব তেজস্বী। সত্যি বলতে,এই গৌণ ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলো এতই তেজস্বী হয় যে এরা আলোর কাছাকাছি গতিতে চলে। এমনকি পানিতেও।৪

শূন্য মাধ্যমে আলো চলে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে। কোনো কণাই এর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। এখন, পানি আলোর গতিকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। বেগ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার। ফলে পানিতে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলা উচ্চ গতির কোনো অতিপারমাণবিক কণা পানিতে আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে চলে। কোনো আকাশযান শব্দের চেয়ে বেশি বেগে চললে তীব্র গুম গুম শব্দ হয়। এর নাম সনিক বুম। একইভাবে কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা কোনো চার্জিত কণা সেই মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র তড়িচ্চুম্বকীয় শকওয়েভ তৈরি করবে। এর নাম চেরেনকোভ বিকিরণ। প্রক্রিয়াটির রুশ আবিষ্কারকের নামেই নামটি দেওয়া। এ কারণে ওহাইয়োর পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা চেরেনকোভ ঝলকের খোঁজে এক গুচ্ছ আলোকসংবেদী ডিটেক্টর স্থাপন করেন। প্রোটনের ক্ষয়কে মহাজাগতিক নিউট্রিনো ও অন্যান্য ভেজাল অতিপারমাণবিক ধ্বংসাবশেষ থেকে আলাদা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট একটি সঙ্কেতের খোঁজ করেন। একের পর একই একইসাথে আসা চেরেনকোভ আলোক সঙ্কেতের জোড়া। এটা নির্গত হবে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জোড়া ভিন্নদিকে গতিশীল হলে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েক বছরের অনুসন্ধানের পরেও ওহাইয়োর পরীক্ষা থেকে প্রোটন ক্ষয়ের পক্ষে জোরালো প্রমাণ মেলেনি। অবশ্য চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, এ পরীক্ষায় সুপারনোভা ১৯৭৪এ থেকে আসা নিউট্রিনো ধরা পড়ে। (বিজ্ঞানে এমনটা হরমহামেশাই ঘটে। একটি জিনিস খুঁজতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য জিনিস পাওয়া যায়) এই বইটি লেখার সময় পর্যন্ত৫ আলাদা কৌশলে নির্মিত অন্য পরীক্ষার ফলাফলও নাবোধক। এর অর্থ হতে পারে, প্রোটনরা ক্ষয়ই হয় না। আবার এও হতে পারে, এরা ক্ষয় হয়, তবে এদের আয়ুষ্কাল ১০৩২ বছরের বেশি। বর্তমান সময়ের পরীক্ষণ উপকরণ দিয়ে এর চেয়ে ধীরগতির ক্ষয় হার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই নিকট ভবিষ্যতে প্রোটন ক্ষয়ের ব্যাপারে কোনো ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভবনাও দেখা যাচ্ছে না।

অনেকগুলো মহা একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Grand unified theory) বিষয়ক তাত্ত্বিক কাজের মাধ্যমে প্রোটন ক্ষয়ের অনুসন্ধান শুরু। লক্ষ্য ছিল সবল(সবল বলের কাজ হলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনদেরকে গেঁথে রাখা) ও দুর্বল নিউক্লীয় বল (দুর্বল নিউক্লীয় বল বেটা তেজস্ক্রিয়তার জন্য দায়ী) এবং তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে জোড়া দেওয়া। এই বলগুলোর সূক্ষ্ম মিশ্রণেও প্রোটন ক্ষয় ঘটবে। তবে এই মহাএকভীবন ভুল হয়ে থাকলেও অন্য উপায়েও প্রোটন ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা হতে পারে প্রকৃতির চতুর্থ মৌলিক বল মহাকর্ষের মাধ্যমে।

মহাকর্ষ কীভাবে প্রোটন ক্ষয় ঘটায় সেটা দেখতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রোটন কিন্তু সত্যিকার অর্থে মৌলিক কণা নয়। নেই কোনো বিন্দুসদৃশ আকৃতি। এটি আসলে একটি যৌগিক কণা। কোয়ার্ক নামে আরও তিনটি ছোট কণা দিয়ে এটি তৈরি। বেশিরভাগ সময়েই প্রোটনের ব্যাস হয় এক সেন্টিমিটারের প্রায় ১০ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। এটা হলো কোয়ার্কদের মধ্যকার গড় দূরত্ব। তবে কোয়ার্করা স্থির থাকে না। প্রোটনের মধ্যে অবিরত অবস্থান বদলাতে থাকে। এরও কারণ কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অনিশ্চয়তা। মাঝেমধ্যেই দুটি কোয়ার্ক একে ওপরের খুব কাছে চলে আসে। আরও কম ঘটলেও অনেক সময় তিনটি কোয়ার্কই খুব কাছে চলে আসে। এমনিতে কোয়ার্কদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। তবে এটা অসম্ভব নয় যে কণাগুলো এতটা কাছে আসবে যে তাদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল অন্য সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী হবে। এটা সত্যি হয়ে থাকলে কোয়ার্করা জড় হয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্ল্যাক হোল তৈরি করতে পারে। প্রকৃত অর্থে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের প্রভাবে প্রোটন নিজের মহাকর্ষের ভারেই গুটিয়ে যায়। এর ফলে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলটি হয় খুব অস্থিতিশীল। হকিং প্রক্রিয়ার কথা মনে করে দেখুন। প্রোটন ক্ষয় থেকে প্রাপ্ত ব্ল্যাকহোলও সাথেসাথেই আবার উধাও হয়ে যায়। তৈরি হয় একটি পজিট্রন। এই উপায়ে প্রোটন ক্ষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এখনও সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। তবে সময়টা ১০৪৫ বছর থেকে ১০২২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

দীর্ঘ সময় পর প্রোটন ক্ষয় হয়েই গেলে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের ওপর তার বড় প্রভাব থাকবে। সব পদার্থ হয়ে যাবে অস্থিতিশীল। এবং সবশেষে উধাও। গ্রহদের মতো কঠিন বস্তুরা ব্ল্যাকহোলেও পতিত না হলেও চিরকাল থাকবে না। খুব দ্রুতই ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। প্রোটনের আয়ুষ্কাল ১০৩২ হলে তার অর্থ হবে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ-কোটি প্রোটন হারাচ্ছে। এই হারে চলতে থাকলে মোটামুটি ১০৩৩ বছর পরে আমাদের পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য তার আগেই অন্য কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

তবে নিউট্রন নক্ষত্র কিন্তু এই পক্রিয়া থেকে মুক্ত। নিউট্রনরাও তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। যে প্রক্রিয়ায় প্রোটন ধ্বংস হয় মোটামুটি সেভাবেই নিউট্রনও আরও হালকা কণায় পরিণত হতে পারে। (বিচ্ছিন নিউট্রন কণা যে কোনো অবস্থাতেই অস্থিতিশীল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যেই ক্ষয় হয়ে যেতে পারে।) শ্বেত বামন নক্ষত্র, পাথর, ধূলি, ধূমকেতু, গ্যাসের হালকা মেঘ এবং অন্যসব মহাকাশ প্রযুক্তিও একইভাবে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। আমরা বর্তমানে যে ১০৪৮ টন পদার্থকে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকতে দেখছি সেটাও একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। হয় ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পতিত হবে। নয়তো ধীরে ধীরে নিউক্লীয় ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ হবে।

প্রোটন ও নিউট্রনও ক্ষয় হলেও অবশ্যই তৈরি হয় ধ্বংসাবশেষ। ফলে মহাবিশ্ব পুরোপুরি পদার্থহীন হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এর একটি উদাহরণ আগেও দেওয়া হয়েছে। প্রোটন ক্ষয়ের সম্ভাব্য একটি উপায় হলো একটি পজিট্রন ও একটি নিরপেক্ষ পাইওন তৈরি হওয়া। পাইওন খুব অস্থিতিশীল। খুব দ্রুত ক্ষয় হয়ে দুটো ফোটনে পরিণত হয়। অথবা ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া। দুই ক্ষেত্রেই প্রোটন ক্ষয়ের ফলে মহাবিশ্ব ক্রমাগত বেশি বেশি পজিট্রন দিয়ে ভরপুর হতে থাকবে। পদার্থবিদিদের বিশ্বাস, মহাবিশ্বে ধনাত্মক (প্রধানত প্রোটন) ও ঋণাত্মক চার্জধারী (প্রধানত ইলেকট্রন) কণার সংখ্যা সমান। এর অর্থ হলো, সবগুলো প্রোটন ক্ষয় হয়ে গেলে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের পরিমাণ সমান হবে। এখন, পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের প্রতিকণা। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের দেখা হলে একে ওপরকে শেষ করে দেয়। পরীক্ষাগারে এই প্রক্রিয়াটি অনায়াসে করে দেখা হয়। কণা দুটির সাক্ষাতের ফলে ফোটন কণা আকারে প্রচুর পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয়।

দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্বে উপস্থিত পজিট্রন ও ইলেকট্রন একে ওপরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে নাকি একটি কণার কিছু অংশ বাকি থেকে যাবে সেটা জানতে অনেক হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে। ধ্বংস হওয়ার ঘটনা হুট করে ঘটে না। বরং একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন প্রথমে নিজেদেরকে পজিট্রোনিয়াম নামে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুতে সজ্জিত করে। এখানে দুজনেই তাদের যৌথ ভরকেন্দ্রকে৬ প্রদক্ষিণ করে। নিজেদের মধ্যকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণেরো প্রভাবে নাচতে নাচতে বেজে যায় মৃত্যুঘণ্টা। এভাবে কণাগুলো সর্পিল পথ বেয়ে একসময় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। সর্পিল পথে কণাগুলো কত সময় থাকবে তা পজিট্রোনিয়াম 'পরমাণুটি' তৈরি হবার সময় ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মধ্যে প্রাথমিক যে দূরত্ব ছিল তার ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে পজিট্রনিয়াম ক্ষয় হতে এক সেকেন্ডের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ সময় ব্যয় হয়। কিন্তু বাইরের মহাশূন্যে কণাগুলোকে নিয়ে নাক গলানোর তেমন কিছু নেই। ফলে এদের কক্ষপথ হতে পারে অনেক বিশাল। পরিমাপ করে দেখা গেছে, ইলেকট্রন ও পজিট্রন থেকে পজিট্রোনিয়াম তৈরি হতে ১০৭১ বছর সময় লাগে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের কক্ষপথ বহু ট্রিলিয়ন আলোকবর্ষ চওড়া হয়। কণাগুলো এতটা ধীরে চলবে যে এক সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগবে বহু মিলিয়ন বছর। ইলেকট্রন ও পজিট্রন এতটাই ধীরগতির হয়ে যাবে যে সর্পিল পথে চলতে ১০১১৬ বছরের মতো দীর্ঘ সময় লাগবে। তবুও এই পজিট্রোনিয়ামের চূড়ান্ত নিয়তি কিন্তু এটি তৈরি হওয়ার সময়ই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব ইলেকট্রন ও পজিট্রনকে কিন্তু ধ্বংস হতে হয় না। যে সময় ধরে ইলেকট্রন ও পজিট্রনরা তাদের বিপরীত চিহ্ন খুঁজতে থাকে সে সময়েই তাদের ঘনত্ব নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকে। এর পেছনে দুটো কারণ কাজ করে করে। একটি হলো ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়াটিই। আর আরেকটি হলো মহাবিশ্বের চিরন্তন প্রসারণ। সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন পজিট্রোনিয়াম তৈরি কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অবশিষ্ট পদার্থের সামান্য ধ্বংসাবশেষ কমতে থাকলে এটি কখনোই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। সবসময়ই কোথাও না কোথাও ইলেকট্রন বা পজিট্রনের বেজোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে। যদিও এমন প্রতিটি কণাই ক্রমাগত বড় হয়ে ওঠা শূন্য স্থানের মধ্যে একা একা অবস্থান করে।

ধীরগতির এতসব মারাত্মক প্রক্রিয়াগুলো শেষে মহাবিশ্ব কেমন হতে পারে তার একটি মোটামুটি চিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমত থাকবে বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। সবসময় উপস্থিত থাকা মহাজাগতিক পটভূমি। এতে রয়েছে ফোটন ও নিউট্রিনো। আবার আমাদের এখনও অচেনা পুরোপুরি স্থিতিশীল কোনো কণাও থাকতে পারে। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এই কণাগুলোর শক্তি কমতে থাকবে। যতক্ষণ না এদের পটভূমি খুব হালকা হয়ে যায়। মহাবিশ্বের সাধারণ পদার্থগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। সবগুলো ব্ল্যাকহোলও শেষ হয়ে যাবে। ব্ল্যাকহোলের বেশিরভাগ ভর ফোটনে পরিণত হবে। আর কিছু অংশ থাকবে নিউট্রিনো আকারে। আর খুবই সামান্য একটি অংশ থাকবে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও আরও ভারী কণা রূপে। এগুলো নির্গত হয়েছিল ব্ল্যাক হোলের একেবারে অন্তিম বিস্ফোরণের ধাক্কায়। ভারী কণাগুলোর সবাই খুব দ্রুত ক্ষয় হয়। আর নিউট্রন ও প্রোটন ক্ষয় হয় আরও ধীরে। ফলে এদের সাথে যোগ দেয় কিছু ইলেকট্রন ও পজিট্রন কণারা। আমরা আজকে যে সাধারণ পদার্থ দেখছি এই কণাগুলোই হলো তার সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন।

তার মানে দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব হবে ফোটন,নিউট্রিনো এবং ক্রমাগত কমতে থাকা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের একটি অচিন্তনীয় ধরনের হালকা স্যুপের মতো। এই কণাগুলোর সবাই ধীরে ধীরে আরও দূরে সরতে থাকবে। এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, এর পরে আর কোনো ভৌত পক্রিয়া সংঘটিত হবে না। এমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটবে না যাতে মহাবিশ্বের বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটতে পারে। যাত্রাপথের শেষে এসেও মহাবিশ্ব যেন পেল চিরন্তন জীবন। অথবা চিরন্তন মৃত্যু বললেই হয়ত সঠিক বলা হবে।

ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিদ্যায় তাপীয় মৃত্যু (ওheat death) নামে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। আমাদের আলোচনায় আসা শীতল, অন্ধকার, বৈশিষ্ট্যহীন প্রায় শূন্য এই নিরস চিত্রই আধুনিক কসমোলজির তাপীয় মৃত্যুর সবচেয়ে কাছাকাছি বিবরণ। মহাবিশ্ব এই অবস্থায় আসতে এত বেশি সময় লাগবে যা কল্পনা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও এটি অসীম সময়ের অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশই মাত্র। আগেই বলেছি, চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়।

এটা সত্যি যে মহাবিশ্বের ক্ষয় পক্রিয়া সম্পন্ন হতে যে সময়ের প্রয়োজন সেটি মানবীয় সময়ের মাপকাঠিতে অনেক অনেক বেশি। এত বেশি যে সে সময়টা আসলে আমাদের কাছে অর্থহীন। তবুও আমরা আগ্রহভরে প্রশ্ন করি, "আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্যে কী ঘটবে? তারা কি অনিবার্যভাবে এমন এক মহাবিশ্বে বন্দি হবে যা খুব ধীরে হলেও অপ্রতিরোধ্যভাবে তাদের চারপাশে অচল হয়ে যাবে?দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানের পূর্বাভাস খুব বেশি প্রতিশ্রুতিশীল নয়। ফলে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের জীবনের জন্যেই অনুকূল কোনো পরিবেশ থাকবে না। তবে মৃত্যু অত সহজও নয়।

অনুবাদকের নোট

১। এক ট্রিলিয়ন = এক লক্ষ কোটি। মানে ১ এর পর ১২টি শূন্য দিতে হবে। অর্থাৎ, ১,০০০,০০০,০০০,০০০।

২। পরম শূন্য তাপমাত্রা:

৩। ওয়াট

৪। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ৩ লক্ষ কিলোমিটার হলেও পানিতে এই বেগ অনেকটা কম। পানির ঘনত্বের ওপর এটা নির্ভর করলেও বেগটা মোটামুটি সেকেন্ডে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার। কিন্তু ইলেকট্রন ও পজিট্রনরা পানিতেও শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে চলে।

৫। এই বইটির আলোচ্য অংশ অনুবাদের সময়ও (ফেব্রুয়ারি, ২০২০) প্রোটন ক্ষয়ের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৬। কোনো একটি সিস্টেমের সবগুলো অংশের গড় অবস্থানকে ভরকেন্দ্র বলে। যেমন, বৃত্তের ক্ষেত্রে এর কেন্দ্রই ভরকেন্দ্র। একই কথা প্রযোজ্য গোলকের ক্ষেত্রেও। আমরা অনেক সময় বলি, বাইনারি স্টার বা জোড়াতারারা একে ওপরকে কেন্দ্র করে ঘোরে। আসলে কিন্তু তারা দুজনের যৌথ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে পাক খায়। সেই ভরকেন্দ্র সাধারণত দুটো তারার মাঝামাঝি কোনো স্থান হয়। আবার আমরা জানি, পৃথিবী,ও বৃহিস্পতির মতো গ্রহরা সূর্যকজে ঘিরে পাক খায়। তবে বাস্তবতা হলো বৃহস্পতি আসলে ঠিক সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। ঘোরে সূর্যের পরিধির বাইরের একটি বিন্দুকে ঘিরে।